OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 09 - 17
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 09 - 17
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

মল্লভূমে শ্রীনিবাস আচার্যের আগমন ও বৈষ্ণবীয় ভাবধারার অনুবর্তন

সহদেব রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sahadebroyhetia@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Srinivasa, Literature, Vaishnavism, Mallabhum, Temple, Region, Cultural, Bengal, Temple, Books

Abstract

The role of Mallabhum region is particularly important in Bengal's literature, art and culture. The creations of this region are imprinted with the uniqueness of the soil and the people here. An important kingdom in this vast region is called Malla Rajya. Which is now known as Bishnupur. As there are all the stories of the rise and fall of the kings of this kingdom on the one hand, on the other hand the Raj Sabha of this kingdom is neglected in this Malla kingdom. But the literature written in the royal court of all those kings is a very important resource in terms of art, literature and culture of Bengal.

Aryanization started on the soil of this region along the path of Jainism. Later Jainism, Buddhism and Brahmanism got mixed up here. Later we find Vaishnavism flourishing. However, it was Srinivasa Acharya who took Vaishnavism to an unimaginable level of expansion in the bosom of Mallabhum. Incidentally, Acharyadeva entered Malla Rajya with 120 book's including 'Manimanjusa' and searched the city of Bishnupur in search of this huge books that was stolen. The later recovery of the books in the court of the then King Birhambir is an unprecedented event. Gradually, in the presence of Srinivasa Acharya, there was a radical change in the king's mind. Maharaja Birhambir's Vaishnava love took initiation into Vaishnava religion from Srinivasa. As a result, all the temples that we see in today's Bishnupur city, started and flourished because of this Vaishnavism. All the kings after Birhambir became addicted and weak to Vaishnavism. So weak that during the reign of King Gopal Singha, when the enemy forces attacked, he was busy chanting the name of Kuladevta 'Madanmohan' and it was during his time that a strange rule was made that every people had to wake up and chant the name of Krishna at least once a day, otherwise he would be punished. At that time many people called it 'Gopal - sing- ar- bagar' (The compulsory worship by Gopal singha's order).

Also various literary works were written inside and outside the Raj Sabha. We find examples of this all over the city. The direct and indirect reason

for the development of the temple city of Bishnupur is the arrival and spread of Vaishnavism. However, the fact that the vast region of Mallabhum lived in a fairly integrated state is also evidenced by the many cultural activities in the region. And the biggest evidence of this is probably the case of "Shrikrishna Kirtan" by Baru Chandidas, the oldest sign of early-medieval Bengali literature, written in this vast region in 1909 AD.

Discussion

মল্লভূম পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার এক অপূর্ব শহর যার এক প্রান্তে লেগে আছে রণক্ষেত্রের এক দুর্দমনীয় ইতিহাস অন্যপ্রান্তে বয়ে গেছে ধর্মের গতিশীল প্রবাহমানতার চিহ্ন। মল্লভূমির এই মাটিতে বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবন যেন শহরের বুকে নতুন পলি সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্ট এক উর্বর মৃত্তিকা, যার উপর ভিত্তি করে নতুনভাবে গড়ে উঠেছে এই মল্লভূম তথা আজকের বিষ্ণুপুর মন্দির নগরী। তবে মল্লভূমির মাটিতে বৈষ্ণব ধর্ম ছাড়াও জৈন ধর্মের আগমন ঘটেছিল এবং তার চিহ্ন ও প্রভাব খুব একটা সুদূর প্রসারী ছিল না। তবুও যতটুকুই জৈনরা মল্লভূমে ও তার পাশ্ববর্তী স্থানে বসবাস স্থাপন করেছিল তার প্রধান কারণই ছিল তাদের ব্যবসা বাণিজ্য। কিন্তু মল্লভূমে জৈন ধর্মের চেয়েও বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটেছিল একসময় এবং তদানীন্তন সময় হতে আজ পর্যন্ত মল্লভূমের মাটিতে বৈষ্ণব ধর্মের আগমন এক পট পরিবর্তনকারী বা যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

আমরা মূলত আলোচনা করছি মল্লভূমের ৪৯তম রাজা বীরহাম্বিরের সময়কালকে নিয়ে। তৎকালীন সময়ে রাজাদের যুদ্ধবিদ্যা বা অস্ত্র-শস্ত্র শিক্ষায় পারদর্শিতা নিয়ে খুব কম প্রশ্নই উঠত। সেদিক থেকে যুদ্ধশাস্ত্রের পারদর্শীতায় অত্যন্ত নিপুন ছিলেন রাজা বীরহাম্বীরও। মল্লভূমির প্রতাপশালী, বলশালী ও জনপ্রিয়তার নিরিখে যে রাজার নামটি সর্বোচ্চ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি হলেন বীরহাম্বির। একাধারে তিনি যেমন দুর্ধর্ষ পরায়ন নৃপতি ছিলেন এবং তার শাসনব্যবস্থা পরিচালনার পদ্ধতি এতটাই পরিকল্পনামাফিক নিখুঁত যে, তার রাজ্য পরিচালনার ক্ষমতার মধ্যে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত চেতনার উন্মেষ দেখতে পায় আমরা। চরিত্রটির মধ্যে কিন্তু সবকিছুর উর্ধ্বে গিয়ে চরিত্রটির যে মহানুভবতা, দয়ালুতা, আবেগপ্রবণতা, নমনীয়তা তা আজীবন মানুষের মনের মনিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত এই রাজা, বীরহাম্বিরের পূর্ব নাম ছিল হাম্বিরমল্ল। অথচ এই হাম্বিরমল্লকে 'বীরহাম্বির' নামে অভিহিত করা হল কেন?

সময়টা তখন ষোড়শ শতাব্দী অর্থাৎ ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দ। আর এই জনপ্রিয় রাজার রাজত্বকাল চলেছিল ১৫৬৫ থেকে ১৬২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, প্রায় সুদীর্ঘ ৫৫ বছর ধরে। আর এই সময়কালকেই অভিহিত করা হয়েছে 'মল্লভূমের স্বর্ণযুগ' হিসেবে। বীরহাম্বিরের সময়কাল থেকেই পাঠান ও মোগলের দ্বন্দ্ব চরম শিখরে পৌঁছায় এবং এক ভয়াবহতার রূপ নেয়। যে কোনো সময়, নানা পারিপার্শ্বিক কারণেই বাংলা তথা এই মল্লভূমের বুকে আঘাত হানতে সক্ষম হবে শত্রুপক্ষ যদি উপযুক্ত তার পরিকাঠামো বা ব্যবস্থাপনাদি না থাকে। সেই আশঙ্কাবশত রাজা বীরহাম্বির তার রাজধানীতে সুদক্ষ ও নিপুণ সৈন্যের বলয় তৈরি করেন, যাকে ভেদ করা খুবই কঠিন এবং দুঃসাধ্য। তবুও এরকম পরিস্থিতিতেও পাঠান সেনাপতি দায়ুদ খাঁ, অতর্কিতে বিষ্ণুপুর তথা সেকালের মল্লভূম আক্রমণ করেন। রাজা কিঞ্চিৎ অবহিত ছিলেন বিষয়টি সম্পর্কে, এই আশঙ্কার কথা ভেবে, কিন্তু ততটা পরিমাণে প্রস্তুত ছিলেন না। তাও তার উন্নততর রণকৌশল ও সুদক্ষ চতুর সৈন্যদের বাহাদুরি ও সাহসের দর্পে যুদ্ধক্ষেত্র দাপিয়ে বেড়ালেন তার সৈন্যরা। সে এক ভয়ানক রোমহর্ষক দৃশ্য! এমতাবস্থায় যুদ্ধকালে পাঠান সৈন্যরা ধীরে ধীরে পযুর্দস্ত হতে থাকে এবং অন্তিম সময়ে পরাজিত হয় দুর্ধর্ষ পাঠান সেনাপতি দায়ুদ খাঁ। এই দায়ুদ খাঁর নেতৃত্বাধীনের সমস্ত প্রজাদের নিথর শরীর স্তূপাকারে পড়েছিল যুঝঘাঁটি বা মুন্ডমালা ঘাটের প্রান্তরে। আর এই মুন্ডমালা ঘাট বর্তমানে বিষ্ণুপুরের উত্তর-সীমান্তস্থিত দেউলী ও চাকদহ নামক গ্রামের অবস্থিত এক প্রান্তর ভূমি। সেই রণক্ষেত্রে দায়ুদ খাঁন নিজে পরাজিত হলেও প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে বাঁচতে সমর্থ হয়েছিলেন কেবলমাত্র রাজা বীরহাম্বিরের বদান্যতায়। সেই যুদ্ধের ভয়হীন লড়াই, অসীম সাহস আর অটুট আত্মবিশ্বাস এবং রণক্ষেত্রের রীতি-নীতি ও অস্ত্র-শস্ত্রের সুনিপুণ দক্ষতার জন্য, সর্বোপরি এই মরণপণ যুদ্ধে বীরের মতো লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া ও জয়লাভের জন্যই তাকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 09 - 17
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'বীরহাম্বির' বলা হয়ে থাকে। আবার অনেকে মনে করেন এই পলায়নরত দায়ুদ খাঁ-ই তাকে নাকি 'বীরহাম্বির' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন।

অর্থাৎ এই রাজা যেমন একদিকে প্রবল প্রতাপান্বিত বীরযোদ্ধা ছিলেন তেমনি ছিলেন অন্যদিকে প্রজানুরঞ্জক, দয়ালু, নিষ্ঠাবান ও সততার প্রতীক আর এই নিষ্ঠাবান ও সৎ রাজাকেও একসময় দস্যু অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই অপবাদকে তুচ্ছ জ্ঞান মনে করে বলা হয় –

> "যারা তাঁর অন্তরের সত্যিকারের পরিচয় জানেন না তাঁরাই তাঁর উপর উক্ত অপবাদ প্রয়োগ করতে পারেন। দস্যুতা প্রবৃত্তি দূরে থাক, তাঁর মন ছিল খুবই মানবদরদী। আর সেই মানবদরদী সত্ত্বাই অতি সহজেই আকৃষ্ট করেছিল তাঁকে মানবপ্রেমের মূর্ত প্রতীক মহান বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি। বিনা আয়াসেই কৃপালাভ করেন শ্রীনিবাস আচার্য্যের মতো মহাপুরুষের। যাঁর আবির্ভাব সম্বন্ধে স্বয়ং চৈতন্যদেব ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, যাঁকে সেই গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর 'দ্বিতীয় কলেবর' বলা হয়।"[১]

অথচ এই দস্যুতার পিছনে রাজা বীরহাম্বিরের কোনো কপট অভিসন্ধি লুক্কায়িত ছিল না। যা ছিল তা এক মহৎ উদ্দেশ্য। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ, বিত্ত-বৈভব-বিলাসিতাময় জীবন কাটানো নয়, তার রাজ্যের সমুদয় উন্নতিকল্পে কেবলমাত্র সামরিক শক্তির বিভাগ ছাড়াও প্রজাদের মঙ্গলার্থে তার সার্বিক বিকাশ ঘটানো, রাজ্যসভা পরিচালনা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেও এক উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া তাঁর লক্ষ্য ছিল। এছাড়াও সেই সময়ের মল্লভূমে যেহেতু ছিল অনেকাংশে দেবদেবী নির্ভর তাই তাদের বিগ্রহ ও মন্দির নির্মাণের কাজেও হস্তনিক্ষেপ করে উন্নতিসাধনের চেষ্টা ছিল বীরহাম্বিরের মধ্যে। বস্তুতই সমগ্র মল্লভূমকে এক নতুন নগরী রূপে জনসমক্ষে তুলে ধরার এক সুপ্ত, অদম্য বাসনা ছিল রাজা বীরহাম্বিরের মধ্যে। এ থেকে রাজা বীরহাম্বিরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মহৎ গুণ গুলির প্রকাশ সম্পর্কে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি।

আমরা যেমন প্রত্যন্ত রাজসভা বলতে মিথিলা রাজসভার কথা, কামতা বা কোচবিহার রাজসভার কথা, ত্রিপুরা রাজসভার কথা, আরাকান রাজ্যসভার কথা শুনেছি তেমনই অন্তর্বর্তী রাজসভা বলতে সাধারণত কৃষ্ণনগর রাজসভা ও বর্ধমান রাজসভার নাম খুব বেশি পরিমাণে আলোচিত হলেও চির উপেক্ষিত থেকে গেছে এই বিষ্ণুপুর রাজসভা। এ প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারত সংস্কৃতি' পুস্তকের 'কাশী' প্রবন্ধে অনেকটা আক্ষেপের সঙ্গে লিখেছেন –

> "আমাদের বাঙ্গালীদের এই হিসাবে দুর্ভাগ্য- কাশী বা মাদুরা, জয়পুর বা আগ্রার মত একটি কলানগরী বাংলাদেশে গড়িয়া উঠিল না। এইরূপ একটি মাত্র নগরী সারা বাংলাদেশের মধ্যে দেখা যায়, সেটি হইতেছে বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুর প্রাচীন মন্দিরে ও নানাবিধ শিল্পকার্য্যে বাংলার সমস্ত নগরগুলির শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু এই বিষ্ণুপুরকে বাঙ্গালী জনসাধারণ চিনিল না, দেখিল না, আদর করিতে শিখিল না।"[২]

আর এই বিষ্ণুপুর রাজসভাতেই বীরহাম্বিরের সময় থেকেই ভাগবত পাঠের একটা প্রথা চলে আসছিল। স্বভাবতই এ থেকে বুঝতে পারা যায়, বৈষ্ণব ধর্ম ও সেই ধর্মের নানা শাস্ত্রচর্চা সম্পর্কেও সেকালের মানুষ অবহিত ছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরকে তথা সেকালের মল্লভূমকে নতুনত্বের ছাঁচে ঢেলে তাকে নতুন রূপ দেওয়াই ছিল হয়তো জগন্মাতার ইচ্ছা। সে এক অপূর্ব ঘটনা যার ছোঁয়ায় বিষ্ণুপুরের বুকে ক্ষাত্রশক্তির অবসান ঘটেছিল। শুরু হয়েছিল মানবতার জয়, হৃদয়াবেগের জয়। মল্লভূমের বুকে বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবনের পিছনেও ছিল সৃষ্টিকর্তার এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস!

মহারাজ বীরহাম্বিরের রাজসভাতেই একজন জ্যোতির্বিদ ছিলেন। যার নাম দেবনাথ বাচস্পতি, সে তার জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাবেই হোক বা কোনো দৈবিক উপায়েই হোক সে রাজাকে জানায় যে, বিষ্ণুপুরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী পথে কিছুদিনের মধ্যেই শকট বোঝায় মহামূল্যবান অনন্তরত্ন সম্পদ অতিক্রম করে যাবে বৃন্দাবন থেকে গৌড়ের উদ্দেশ্যে। এরকম অবস্থায় রাজা তাঁর রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করবার আশায় মন্ত্রী-পারিষদ সহ সকলে মিলিত হয়ে শলা-পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন শকট বোঝায় অমূল্য রত্নরাজি হস্তগত করার। কিন্তু কোনোরকম কোনো মানুষের ক্ষয়-ক্ষতিহীনভাবে। কথা মতো সেই কাজ, নির্দিষ্ট সময়ের, নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট ক্ষণের আগেই রাজার লাঠিয়ালরা সহ সৈন্য সামন্তগণ গোপালপুর নামক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 09 - 17
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্থানে উপস্থিত হয়ে যায়। দেবনাথ এবং মহারাজা অপেক্ষমানরত অবস্থায় থাকেন। কিছু সময় পরেই এক শকট বোঝায় গাড়ি এসে উপস্থিত হয় এবং গাড়ির মধ্যে অবস্থিত মানুষগুলি ক্লান্ত থাকার জন্য তারা সেই গোপালপুর নামক স্থানে গাড়ি থামিয়ে খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম নিতে থাকেন। শারীরিক ক্লেশের জন্যই তারা নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েন খুব সহজেই। ঠিক এই সুযোগেই তাদের অগোচরে সকল বাক্স ভর্তি জিনিসগুলি নিয়ে অন্তর্হিত হল রাজার লাঠিয়ালরা। গাড়িমধ্যে যে তিনজন ছিলেন তাঁদের নাম যথাক্রমে- নরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ এবং শ্রীনিবাস আচার্যদেব যিনি বাল্যকাল থেকে চৈতন্যদেব ও তার প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি প্রবল ভাবে আকৃষ্ট ছিলেন।

এই শ্রীনিবাস আচার্য আসল পরিচয়ই বা কী?

> "শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম যাদের চেষ্টায় বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে শ্রীনিবাস আচার্যের স্থান তাদের পুরোভাগে। মহাপ্রভুর জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়ে যার প্রথম স্ফুরণ, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের লেখনীতে যার পূর্ণ রূপায়ণ, সেই ধর্মকে তার আদি উৎসভূমির লোকেদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য।"[৩]

মধ্যযুগের বেশিরভাগ কবিদিগেরই সম্পূর্ণ জন্মবৃত্তান্ত অনেকাংশে উদ্ধার করা দুর্লভ। তবে সেই পর্যায়ে শ্রীনিবাস আচার্যও এর ব্যতিক্রম নয়। শ্রীনিবাস আচার্য সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থও রয়েছে, যেখানে আংশিক ভাবে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন 'নরোত্তমবিলাস', 'প্রেমবিলাস', এছাড়াও মনোহর দাসের 'অনুরাগবল্লী'তে এবং নরহরি রচিত 'শ্রীনিবাস চরিত্র'। কিন্তু একমাত্র পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় নরহরি সরকারের 'ভক্তিরত্নাকরে'। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে,

> "চৈতন্যদেবের মৃত্যুর (১৫৩৩ খ্রীঃ) সময় শ্রীনিবাস কিশোর বয়স্ক। ওই সময় তাঁর বয়স ১৩/১৪ বছরের মতো ছিল ধরলে ১৫১৯/ ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম বলা যেতে পারে।"[৪]

আচার্যদেবের আদি নিবাস নবদ্বীপের চাকন্দি গ্রামে। চৈতন্যদেবের মত ইনিও ভক্তিমান পুরুষ ছিলেন। শিশু বয়স থেকে শ্রী চৈতন্যের ধর্ম ও জীবন দর্শনের প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁর পিতা ছিলেন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য। তিনিও চৈতন্যের প্রতি অসম্ভব ভক্তি পরায়ণ ছিলেন। শ্রীনিবাস তাঁর খুব অল্প বয়সেই পিতাকে হারান। তারপরে সে আরো মনোযোগকে নিবিড় করে তোলেন চৈতন্যদেব ও তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি। পিতার মৃত্যুর পর তিনি চৈতন্যদেবের জননী শচীদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ গ্রহন করেন এবং তাঁর পরামর্শে চৈতন্য পার্শ্বচর গদাধরের কাছে ভাগবত পড়ার জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হতে বলেন। তৎপরবর্তী কালে গদাধর দেহত্যাগ করেন। শ্রীনিবাস হতাশ ও অবসাদের বশবর্তী হয়ে পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে আসেন। সেখানে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পত্নী জাহ্নবীদেবীর কাছে পরামর্শ চান। তিনি সবকিছু আচার্যের নিকট শোনার পরই তাঁকে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর নিকট বৃন্দাবন যাত্রা করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার এ কী কঠিন পরীক্ষা! শ্রীনিবাস বৃন্দাবন যাত্রার সম্পূর্ণ করার অনতিদূরেই শুনতে পান রূপ ও সনাতন গোস্বামী দেহদান করেছেন। এই খবর যেমন শ্রীনিবাসকে মর্মাহত করল, তেমনি সমগ্র বৃন্দাবনবাসীও এক গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হলেন। কেননা এই দুই গোস্বামীগণ চৈতন্যের বাণী ও ধর্মকে মানুষের মধ্যে যেভাবে ছড়িয়ে মানুষকে প্রেম ধর্মে আকৃষ্ট করেছিলেন, তাঁদের মত মানুষের সন্ধান সত্যিই সেকালে ও একালের মতো সময়ে দুর্লভ। কিন্তু ঈশ্বরের ওপর যাঁর অগাধ বিশ্বাস, মানুষের প্রতি যার অসীম ভালোবাসা, জন্মাবধি চৈতন্যের প্রতি যাঁর প্রবল অনুরাগ, সেই শ্রীনিবাস আচার্যকে এত সহজে দমিয়ে রাখা যায় না। তাই শত আঘাতকে বুকে চেপে নিয়েও নিজ গন্তব্যে পৌঁছবে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে রইলেন তিনি। অবশেষে শ্রীনিবাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত হয়েই, তাঁর নিষ্ঠা, ভক্তি ও বিশ্বাস দেখে শ্রীজীব গোস্বামী নিজের কাছে স্থান দেন এবং তাঁকে রীতিমতো শিক্ষাদান করেন। প্রবল পণ্ডিত্য অর্জনের পরই সেই শিক্ষার উজ্জ্বল দীপ্তি ও অসীম জ্ঞানকে লোকসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এবং চৈতন্যের মানবপ্রেমকে বিশ্বের দরবারে প্রচার করবার লক্ষ্যে গোস্বামীগণের নির্দেশ মত নরোত্তম, শ্যামানন্দ ও শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবনের অসংখ্য মূল্যবান বৈষ্ণব-গ্রন্থাদি ও পুঁথি নিয়ে শকট বোঝাই করে বৃন্দাবন থেকে গৌড়ের উদ্দেশ্যে প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্রতী হতে বললেন। এই প্রসঙ্গে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃঃ ১১০৮-১১১৪) লিখেছেন–

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 09 - 17
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান কেন্দ্র সর্বপ্রথম ছিল নবদ্বীপ। চৈতন্যের সন্ন্যাসের পর নবদ্বীপের আলোক নিভিয়া যায়। চৈতন্যদেব অষ্টাদশ বৎসর পুরীতে ছিলেন। তাঁহার তিরোধান পর্যন্ত সেই আলোককেন্দ্র পুরীধামে প্রবর্তিত হয়। তারপর কয়েকবৎসর ১৫৩৩ হইতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্দ্ধশতাব্দীর কিছু অধিককাল সেই আলোক বৃন্দাবনে জ্বলিতে থাকে। ষট্ গোস্বামীরা এই আলোক জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাদের স্বর্গারোহণে - বিশেষতঃ জীব গোস্বামীর তিরোধানের সহিত সেই আলোক বৃন্দাবনে নিষ্প্রভ হইলে শ্রীনিবাস আচার্য সেই আলোক বিষ্ণুপুরে প্রজ্জ্বলিত করেন। সেই থেকে পূর্ণ দুই শতাব্দীকাল বিষ্ণুপুর রাজসভাই বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও বৈষ্ণব শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্র স্বরূপ ছিল।"[৫]

আর সেই যাত্রা পথে রওনা দিয়েই ঘটে গ্রন্থচুরির ঘটনা, বিষ্ণুপুরের উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী প্রান্তে গোপালপুর নামক স্থানে।

ভগবানের কি বিচিত্র লীলা! কীভাবে সেই আচার্য শ্রীনিবাস ও মল্লরাজা বীরহাম্বির পরস্পর একই সূত্রে গ্রথিত হল এবং পরবর্তীকালে তাঁদেরই হাত ধরে কীভাবে মল্লভূমের শ্রীবৃদ্ধি পেল এবং বিষ্ণুপুরকে 'দ্বিতীয় বৃন্দাবনে' পরিণত করা হল তা আমাদের আলোচনার প্রয়োজন। বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী স্থানে গ্রন্থ হারানোর পর যখন তাঁদের নিদ্রাভঙ্গ হয় তখন তাঁরা পুঁথি হারানোর বেদনায় আকুল হয়ে উঠলেন সকলেই। এমতাবস্থায় তারা কী করবে ভেবে না পেয়ে দিশেহারা হয়ে ওঠেন। এই অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে যেভাবে –

> "শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি প্রভাত সময়ে।
> ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণে।।
> কিছু না খোঁজ পাইয়া করয়ে ক্রন্দন।
> ই কি বজ্রঘাত হৈল কহে সর্ব্বজন।।
> নরোত্তম কহে আমি প্রান তিয়াগিব।
> শ্যামানন্দ কহে এই অনলে পশিব।।
> শ্রীনিবাস আচার্য্যের মনে হইল যাহা।
> কহিতে বিদরে হিয়া কি কহিব তাহা।।"[৬]

তার কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁরা নিজেদের সম্বরণ করে তাঁরা গ্রন্থ খোঁজার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। এক্ষেত্রে শ্রীনিবাস নরোত্তমকে গৌড়ের উদ্দেশ্যে, শ্যামানন্দকে উৎকলে যাবার পরামর্শ দেয়। তিনি স্বয়ং বিষ্ণুপুর সংলগ্ন স্থানে হারিয়ে যাওয়া পুঁথির সন্ধান করতে থাকেন। এইভাবে দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হবার পর, এক সময় শ্রীনিবাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় বিষ্ণুপুরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত দেউলী গ্রামের কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্তী নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে। সে সবকিছু অবগত হয়ে শ্রীনিবাসকে আশ্রয় দেন এবং হারানো পুঁথি খুঁজে পাওয়ার জন্য রাজার কাছে আবেদন করতে নিয়ে যান একদিন। অথচ ভগবানের এ এক অপরূপ লীলা! সেই সময় যখন তারা রাজদরবারে পৌঁছায় তখন ভগবত গীতার 'রাসপঞ্চাধ্যায়' পাঠ করে রাজা বীরহাম্বিরকে শোনাচ্ছিলেন রাজসভার সভাপন্ডিত ব্যাসাচার্য। শ্রীনিবাস কিয়ৎক্ষণ শ্রবণের পরই বুঝতে পারলেন এ তাঁদের হারিয়ে ফেলার পুঁথির অংশেরই মর্মার্থ। তারপরেও ক্রমে ধৈর্য্যের সহিত শুনতে গিয়ে বুঝলেন ব্যাসাচার্য তাঁর ব্যাখ্যায় ভুল অর্থ করছেন। এমতাবস্থায় শ্রীনিবাস তাঁর মৌনতা আর বজায় রাখতে পারেননি। সর্বসমক্ষে সে উচ্চনাদে জানায় যে, ভাগবতের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। একথা শোনা মাত্রই রাজদরবার যেমন সম্পূর্ণ নীরব, তেমনি ব্যাসাচার্য সহ মহারাজা বীরহাম্বিরও অবাক। কেননা সভামধ্যে এত সাহস কার-ই বা থাকতে পারে যে পণ্ডিত ব্যাসাচার্যের ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রমাণিত করতে পারে! পুরো সভামধ্যস্থল যখন চুপ তখনই রাজা আদেশ করলেন যে, এই মন্তব্য যিনি করেছেন তিনি কি এর সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন? এরপর আচার্যদেব সকলের মাঝে গিয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তিমিশ্রিত সুরে ভাগবতের ব্যাখ্যা করলেন। ব্যাস আর কী! সেই ভক্তিমাখা ব্যাখ্যায় বীরহাম্বিরের হৃদয়াশ্রু বিগলিত হল এবং তিনি প্রবলভাবে শ্রীনিবাসের ব্যক্তিত্ব ও ব্যাখার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁকে সিংহাসন থেকে নেমে এসে প্রণাম করে গুরুপদে বরণ করে

নিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি রাজা। শ্রীনিবাসের সান্নিধ্য লাভ করে রাজার সমস্ত ক্ষাত্রশক্তি ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে থাকল এবং বৈষ্ণব প্রেমে হৃদয় উদবেলিত হল। শ্রীনিবাসের মুখনিঃসৃত চৈতন্যের কথা শোনা মাত্রই অঝোরে প্রেমাশ্রু নির্গল হত রাজার। তারপরে গ্রন্থচুরির সবিশেষ বৃত্তান্ত রাজা শ্রীনিবাসকে জানায় এবং তার পরিবর্তে রাজা চুরি করা গ্রন্থগুলিও ফিরিয়ে দেবার আশ্বাসও প্রদান করেন। একথা সমগ্র বৃন্দাবনে পৌঁছানোর পরই এক আনন্দের কলরোল ওঠে আকাশে-বাতাসে এবং এই সমস্ত মূল্যবান বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পুনরুদ্ধার হবে জেনে এক মহা উৎসবেরও আয়োজন করা হয়েছিল।

এই ভাবেই রাজা বীরহাম্বির ও শ্রীনিবাসের মধ্যে সম্পর্কের দৃঢ়তা আরও মজবুত হয়। মহারাজা তারপরে শ্রীনিবাসের সকল বৃত্তান্ত শুনে সমস্ত পুঁথি দেখালে শ্রীনিবাস আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। শ্রীনিবাস তৎক্ষণাৎ আশীর্বাদ পূর্বক 'কৃষ্ণপদে মতি হোক' এই কথা বলে রাজা বীরহাম্বিরকে জড়িয়ে ধরেন এবং আশীর্বাদ করেন। তারপর থেকেই শ্রীনিবাস ও রাজা বীরহাম্বির একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠলেন। রাজসভার যে কোনো বিষয়ই, সদ্য ধ্যান-মন সমর্পিত যাঁর পদতলে সেই শ্রীনিবাসের অনুমতি না নিয়ে কোনো কাজই সম্পন্ন হত না। এমনকি তাঁর নব্য গুরুর থেকে নিত্যই চৈতন্য কথা ও বাণী শ্রবণের মধ্য দিয়ে এক বিশাল পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল রাজার হৃদয়মধ্যে। যত দিন অগ্রসর হয়েছে ততই বীরহাম্বিরের হৃদয় সিক্ত হয়েছে চৈতন্য-প্রেমে। অবশেষে মহারাজা তাঁর নব-নির্বাচিত গুরুকে বিষ্ণুপুরেই স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য অনুরোধ জানান। তাতে খুব সহজে রাজি না হলে, বিষ্ণুপুরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা সকলে মিলে অনুরোধ করেন শ্রীনিবাসেকে। তারপরেই আচার্যদেব বিষ্ণুপুরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত রঘুনাথ চক্রবর্তীর কন্যা পদ্মাদেবীর সাথে পরিণয়ে আবদ্ধ হন, তারপর থেকেই শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরেই স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। এই সূত্রে বলে রাখা প্রয়োজন এটি শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় বিবাহ ছিল। তাঁর প্রথম বিবাহও হয়েছিল। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্রসন্তান হয়, যার নাম রাখা হয়েছিল গতিগোবিন্দ (মতান্তরে গীতগোবিন্দ), তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল বৃন্দাবনচন্দ্র। তবুও তাঁর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে অধিক পরিচিত ছিলেন হেমলতা দেবী। যিনি পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সাহিত্যেও সুপরিচিত হয়ে আছেন। আচার্যদেবের সঙ্গ লাভ করে মহারাজা বীরহাম্বির সর্বদা সদাই খুশিতে বিরাজ করতেন। গুরু আচার্যদেবের সাথে বৃন্দাবনও যান তিনি, সেখানে গিয়ে বৃন্দাবনের মতো এক অনৈসর্গিক পরিবেশ এবং মনোরম আবহাওয়ায় মনের এক অপরূপ ভাবান্তর ঘটে রাজার মনে। যেদিকে চোখ যায় সবই যেন কৃষ্ণময় দেখতে থাকেন তিনি এবং বৃন্দাবনের এই অপরূপ, অকৃত্রিম সৌন্দর্য দেখে তিনিও মনে মনে সংকল্প করেন তাঁর স্বপ্নের রাজধানীকে এই একই অনুকরণে শোভা দানে বর্ধিত করবেন। আর এই বৃন্দাবন থেকেই ফিরে এসে মহারাজা বীরহাম্বিরের সেই চিন্তা ভাবনার স্বকীয় প্রতিফলন দেখতে পায় আমরা পরতে-পরতে মল্লভূমের এই লাল, রুক্ষ মৃত্তিকার বুকে।

আমরা জানি যে, আচার্য শ্রীনিবাস বীরহাম্বিরের রাজসভায় আসার অনেক আগেও কিন্তু মল্লভূমের মাটিতে বৈষ্ণব ধর্মের লক্ষণ দৃশ্যমান ছিল। কেননা বাঁকুড়া জেলার সুবিখ্যাত পাহাড় শুশুনিয়াতেই রাজা চন্দ্রবর্মার একটি লিপি উদ্ধার করার পরেই বোঝা যায়, সেই লিপি আসলে বৈষ্ণব ধর্মের স্বাক্ষরতারই পরিচয় দেয়। 'এলাহাবাদ প্রশস্তি' থেকে জানা যায়, সমুদ্রগুপ্ত আর্যাবর্তের যে নয়জন রাজাকে পরাজিত করেছিলেন, তাদের মধ্যে চন্দ্রবর্মাও ছিলেন। রাজা চন্দ্রবর্মা পখন্নার অধিপতি ছিলেন। আসলে শুশুনিয়া পাহাড়ের থেকে কিয়দংশ দূরেই এই গ্রাম অবস্থিত। গ্রামটির চতুর্দিকে পুষ্করিণী বা পুকুরে ঘেরা ছিল বলেই হয়তো এই 'পুষ্করিণী' পরিবর্তিত হয়েছে 'পোখরনা'তে। তবুও শুশুনিয়া পাহাড়ের উৎকীর্ণ লিপির স্রষ্টা হিসাবে রাজা চন্দ্রবর্মাকে নিয়ে নানা মুনির নানা মত প্রচলিত আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই চন্দ্রবর্মাকে স্বীকার করে নিলেও, রাঢ় বঙ্গের বিখ্যাত গবেষক, ক্ষেত্র-সমীক্ষক মানিকলাল সিংহের মতে –

> "পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মার আমলের কোন বিষ্ণুমূর্তি এ পর্যন্ত বাঁকুড়ার কোন গ্রাম হইতে পাওয়া যায় নাই। শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ লিপির ঠিক উপরেই একটি চক্র উৎকীর্ণ রহিয়াছে এবং চন্দ্রবর্মা যে চক্রস্বামীর দাসগণের অন্যতম তাহাও লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু চক্রটির চতুর্দিকে চৌদ্দটি অগ্নিশিখা এবং কেন্দ্রে একটি সুবৃহৎ অগ্নিশিখার নক্সা হইতে কোনক্রমেই জোর দিয়া বলা যায় না যে, উক্ত চক্রটি বিষ্ণুচক্র। আরও বলা যায় যে, চক্রস্বামী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 09 - 17
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> ভগবান তথাগতকেও বলা হইত। বৌদ্ধধর্মের প্রতীকই চক্র। জৈন ধর্মেও চক্রের উল্লেখ রহিয়াছে।"[৭]

এছাড়াও মল্লভূমের মাটিতে শ্রীনিবাসের পদধূলি পড়ার আগেও আমরা দেখেছি রাজা বীরহাম্বিরের সভায় নিত্যই ভগবতগীতা পাঠ হত। তবে আমার মনে হয়, বেগবতী নদীর যেমন তার বহমান পথে বাধা পেলে তার গতি আরও বাড়ে, তদ্রূপ মল্লভূমের মাটিতে শ্রীনিবাসের আগমন যেন বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব আকর্ষণের গতি বৃদ্ধিরই পরিচায়ক। ধীরে ধীরে বৈষ্ণব প্রেমে আকুল হয়ে মল্লরাজা বীরহাম্বির তাঁর স্বপ্নের নগরীতে তৈরি করলেন একের পর এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বিষ্ণুপুরের বুকে এখনও সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর আশ্চর্য সৃষ্টি রাসমঞ্চ। যা তৈরি হয় আসলে বীরহাম্বিরের সময়কালেই ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে। এই রাসমঞ্চের কাহিনীর অতি মনোহর। সারা রাজ্য জুড়ে সমস্ত মন্দির থেকে ১০৮টি রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি রাস উৎসবের দিন এই রাসমঞ্চে এসে হাজির হত এবং মহাধূমধাম করেই পালিত হত রাসমঞ্চের রাস-উৎসব। এছাড়াও বৃন্দাবনের আদলে তিনি বিষ্ণুপুরেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করে খনন করান একের পর এক সুবিশাল বাঁধ। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যমুনা বাঁধ, কালিন্দী বাঁধ, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, কালীদহ প্রভৃতি।

> "সাক্ষীগোপাল ও ষড়ভূজ নামে আরও দুটি বিরাট ও বিশিষ্ট দারুমূর্তি ঐ সময়েই নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। 'ষড়ভুজ' বিষ্ণুপুর কাদাকুলী মহল্লায় তাঁর শ্রীমন্দিরে এবং 'সাক্ষীগোপাল' সাক্ষীগোপাল পাড়া মহল্লায় অবস্থিত চৈতন্যদাস মোহান্তদের বাড়ীতে আছেন।"[৮]

এছাড়াও সেই সময় অনেক বিগ্রহের নামে বহু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিও দান করে গেছেন এবং সেকালের অনেক পুরোহিতদেরও নিঃস্বার্থে ভূমি দান করে গিয়েছেন রাজা বীরহাম্বির। শুধু তাই নয়, বৈষ্ণব প্রেমে পাগল হয়ে তিনি পদাবলীও পর্যন্ত রচনা করেছিলেন। যা তাঁর বৈষ্ণব ভক্তির এক অসামান্যতার নির্দশন হিসাবেও আমরা দেখতে পাই। তাঁর সেই দুটি পদাবলীর উল্লেখ পাই আমরা 'ভক্তি রত্নাকর' নামক বৈষ্ণব গ্রন্থে। তাঁর প্রথম পদটি –

> "প্রভু মোর শ্রীনিবাস   পুরাইলে মনের আশ
> তোয়া বিনে গতি নাহি আর।"

শ্রীনিবাসকে উদ্দেশ্য করে লেখা এবং দ্বিতীয় পদটি কালাচাঁদের পায়ে সমর্পিত করে লেখা। –

> "শুনগো মরম সখী   কালিয়া কমল আঁখি
> কিবা কৈল কিছুই না জানি।"

তাঁর এই অবিরাম পরিশ্রম ও স্বপ্নকে সার্থক রূপ দান করার জন্যই শ্রীনিবাস আচার্য বিষ্ণুপুরকে 'গুপ্ত বৃন্দাবন' নামে আখ্যায়িত করলেন। পরবর্তীকালে বীরহাম্বিরের পর থেকেই বৈষ্ণব ধর্মের যে চারাগাছ বিষ্ণুপুরের লাল মাটির দেশে প্রোথিত হল তাই ধীরে ধীরে মহীরুহের আকার ধারণ করেছিল, তার নির্দশনও পাই আমরা বীরহাম্বিরের পরবর্তীকালের রাজাদের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী ও নিদর্শন থেকে।

> "ফসিল যেমন মানুষের জৈব অস্তিত্বের আদিততম সাক্ষী, টেরাকোটাও তেমনি বোধহয় মানব-সংস্কৃতির প্রাচীনতম প্রমাণ।"[৯]

বীরহাম্বিরের পুত্র প্রথম রঘুনাথ সিংহ প্রতিষ্ঠা করলেন- 'শ্যামরায়ের মন্দির', 'জোড়বাংলো' বা 'কৃষ্ণরায় মন্দির'। উক্ত মন্দির দুটিই মাকড়া পাথরের নির্মিত এবং টেরাকোটার এক অভূতপূর্ব নিদর্শন পাওয়া যায় উক্ত মন্দির দুটিতে। যা থেকে তৎকালীন শিল্পীর অপূর্ব শৈল্পিক মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দির দুটির গাত্রে রামায়ণ, মহাভারত, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, ভাগবৎ, স্হল ও নৌ যুদ্ধ, শিকারের দৃশ্য প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটনার এক অপূর্ব মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায় মন্দিরের গাত্রের টেরাকোটায়। বিষ্ণুপুরের এই শ্যামরায় মন্দিরে যে পরিমাণ টেরাকোটার নিদর্শন আছে সে প্রসঙ্গে অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

> " 'টেরাকোটা' অলংকরণের অন্তহীন প্রাচুর্য ও সুকুমার লালিত্যে, গোটা বাংলাদেশে আর একটিমাত্র দেবালয় শ্যামরায় মন্দিরের সঙ্গে উপমিত হতে পারে; সেটি পূর্ব-পাকিস্তানের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 09 - 17
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দিনাজপুর জেলার কান্তনগরে অবস্থিত। অধুনা বিদেশী, সে দেবগৃহটিকে হিসাবে না ধরলে, পশ্চিমবঙ্গের যাবতীয় 'টেরাকোটা' মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরটি যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"[১০]

বৈষ্ণব মন্দির হিসাবে প্রতিষ্ঠিত শ্যামরায় মন্দিরটিতেও শাক্ত, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মূর্তিও লক্ষ্যমান। এছাড়াও বিষ্ণুপুরের আদি কুলদেবতা মাতা মৃণ্ময়ী, যিনি শাক্ত দেবী রূপে পূজিত হয়ে থাকেন, তিনি আবার নানা রূপে নানাভাবে পূজিত হন। আকৃতিতে ও ঐশ্বর্যে তিনি যেন মহিষাসুরমর্দিনী মা দুর্গারূপেই এখন পূজিত। যেখানে মা মৃণ্ময়ী দেবীর মাথার ওপর বিরাজমান ধ্যানমগ্ন সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের দেবতা মহাদেব, যাঁর মাথায় রয়েছেন মা গঙ্গা। তবে মা মৃন্ময়ী তাঁর উগ্র রূপের পরিবর্তন ঘটিয়ে আমাদের কাছে ধরা দেন পরম বৈষ্ণবী হয়ে। বৈষ্ণবীয় ভাবধার প্রতিফলন মন্দিরগুলির মধ্যে রক্ষা পেলেও শাক্ত দেবীর চিহ্নও তন্মধ্যে বিদ্যমান। এ থেকেই ধারণা করা যায়, তৎকালীন শিল্পীদের নির্মিত শিল্পকলায় শিল্পীমনের কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা ছিল না। শিল্পীরা তাদের আপনমনে এইসব কারুকার্যময় অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে গেছেন, যা আজকের যুগেও মানুষকে মেলবন্ধনের পাঠ দেয়। আবার 'রাধাশ্যাম' মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা করেন মহারাজা চৈতন্য সিংহ। মন্দিরের গাত্রে যে প্রতিষ্ঠাফলক রয়েছে সেসব বিচার করে বিষ্ণুপুরের সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির হিসাবে ধরে নেওয়া হয় কালাচাঁদ মন্দিরটিকে, যেটির প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ সিংহ। এছাড়াও অষ্টাদশ শতাব্দীর সময়ে প্রতিষ্ঠিত মদনগোপালের পাথরের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি তৈরি করেন দ্বিতীয় বীরসিংহের মহিষী রাণী শিরোমণি। মল্লরাজ্যে প্রবেশের মুখেই সুবিশাল পাথরদরজার অতিক্রম করেই রয়েছে লালজী মন্দির, এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা করেন শ্রী রঘুনাথ সিংহের পুত্র বীরসিংহ (দ্বিতীয় বীরসিংহ)। এছাড়াও রাজা গোপাল সিংহের রাজত্বকালে এমন এক অদ্ভুত নিয়মের পরিচয় পাই, যেখানে প্রত্যেক রাজ্যবাসীকে অন্তত একবার হলেও কৃষ্ণনাম জপ করতে হবে নইলে শাস্তি প্রদান করা হবে। এই বিষয়টিই সেকালে 'গোপাল সিং এর ব্যাগার' নামেও পরিচিত ছিল। এছাড়াও ইঁটের তৈরি মন্দিরগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় মন্দির রূপে খ্যাত 'মদনমোহন মন্দির', যেটি প্রতিষ্ঠা করেন রাজা দুর্জন সিংহ। এরকম নানা প্রকারের নানা বিধ স্থানে বিষ্ণুপুরের বুকে ছড়িয়ে রয়েছে একাধিক মন্দির। কোনটি হয়তো ভগ্নপ্রায়, কোনোটি এখনো Archeological survey-র দ্বারা সংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। মন্দিরগুলির মাকড়া পাথর ও ক্ষয়িত ইঁটের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে সে সময়ের রাজাদের ইতিহাস ও তাঁদের অসাধারণ সৃষ্টি নৈপুণ্যের কাজ। এসব জানার জন্য শুধু প্রয়োজন হয় ইতিহাসের প্রতি প্রবল বিশুদ্ধ আকাঙ্খা আর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, অনুসন্ধিৎসু মনের। আর এই সমস্ত মন্দিরগুলি সেকালের বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ারে ফলে সঞ্চিত উর্বর পলিমাটির বক্ষেই সৃষ্ট হয়েছিল এ কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

শুধু মন্দির সৃষ্টিই নয়, সেকালের মল্লরাজাদের রাজসভায় সাহিত্য রচনার অনুকূল পরিবেশ ছিল তাও অনুমেয়। মল্লভূম ও রাজধানীর পরিমণ্ডলের মধ্যে এমন কিছু কবিরও পরিচয় পাওয়া যায়, যাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মল্লরাজারা। এছাড়াও সেই সময়ের সমসাময়িক বেশ কয়েকজন কবি সাহিত্যিকের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তারা হলেন- উত্তম দাস, প্রভুরাম, শঙ্কর কবিচন্দ্র প্রভৃতি কবিবর্গ। এদের মধ্যে শঙ্কর কবিচন্দ্র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও পরিচিত।

"শঙ্কর কবিচন্দ্র বা দ্বিজ কবিচন্দ্রের জীবনকাল ব্যপ্তি চারজন মল্লরাজার রাজত্বকাল জুড়ে বিস্তৃত।"[১১]

এই শঙ্কর কবিচন্দ্রই বীরসিংহ, গোপাল সিংহ, রঘুনাথ সিংহের আমলের কবি ছিলেন। তাঁর রচিত মূল গ্রন্থের সংখ্যাও পাঁচটি - 'শিবমঙ্গল', 'অনাদিমঙ্গল', এছাড়াও তিনি 'রামায়ণ', 'মহাভারত' ও 'ভাগবতে'র অনুবাদক ছিলেন। তাছাড়াও রাধাবল্লভ দাসের 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে যাঁর ভণিতাযুক্ত ১৮ টি পদ সংগৃহীত আছে। শ্রীনিবাস আচার্যের গুণগান করে শঙ্কর কবিচন্দ্র দুটি পদও রচনা করেছিলেন। ভক্তিদাসের 'অর্জ্জুন সংবাদ', দামোদর দাসের 'বৃন্দাবন পত্তম', প্রেমদাসের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদি', দ্বিজ বসনের - 'লক্ষ্মীর ব্রতকথা' বা 'লক্ষ্মীমঙ্গল' প্রভৃতি কবি বা পদকর্তা সকলেই মল্লভূম সীমানার অধ্যুষিত কবিগণ। মল্লভূম পরিমণ্ডলের সেই অনুকূল বাতাবরণে একই সঙ্গে ধর্ম-সাহিত্য রক্ষিত হয়েছে। এই মল্লভূম বা আজকের বিষ্ণুপুর যেন ভারতের শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের এক পবিত্র মিলনভূমি। তাই এ সম্পর্কে হান্টার এর মতামতই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়-

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 09 - 17
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"Bishenpore was the most renowned city in the world, and it became more beautiful than beautified house of Indra in heaven."[১২]

Reference:

১. কর্মকার, শ্রীফকিরনারায়ণ, 'বিষ্ণুপুরের অমরকাহিনী', কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ২০১৮, পৃ. ৮৬
২. দাশগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন, 'বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা', বিষ্ণুপুর, ২০১৫, পৃ. ৩১
৩. মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুখময়, 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম', কলকাতা, ১৯৫৮, পৃ. ১৮৬
৪. মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুখময়, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম', কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ১১৩-১১৪
৫. দাশগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন, 'বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা', বিষ্ণুপুর, ১৩৮৬, পৃ. ৩১-৩২
৬. চক্রবর্ত্তি, শ্রী শ্রী নরহরি, 'ভক্তিরত্নাকর', দ্বিতীয় সংস্করণ, চৈতন্যাব্দ ৪২৬, পৃ. ৪৯৪
৭. সিংহ, মানিকলাল, 'পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি', বিষ্ণুপুর, দি নিউ মির্নাভা প্রেস, ১৩৮৪, পৃ. ৮১
৮. কর্মকার, শ্রীফকিরনারায়ণ, 'বিষ্ণুপুরের অমরকাহিনী', কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ২০১৮, পৃ. ১০৬-১০৭
৯. চন্দ্র, মনোরঞ্জন, 'মল্লভূম বিষ্ণুপুর', কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ১৪১০, পৃ. ৮৪
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার, 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি', কলকাতা, পূর্ত বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৭৭, পৃ. ৮৯
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, 'রাজসভার কবি ও কাব্য', কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৬, পৃ. ১৫৭
১২. HUNTER, W.W, 'THE ANNALS OF RURAL BENGAL', NEW YORK, 1868, P. 444